বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে প্রবুদ্ধ ভারতীয় নারী

প্রব্রাজিকা দিব্যানন্দপ্রাণা

ভারতীয় ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে একটি আশ্চর্য ঘটনা আমাদের নজরে আসে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ভারতে সমাজসংস্কারের শুরু। রাজা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন সমাজসংস্কারক আন্তরিকতার সঙ্গে বহু বিষয়ে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রয়াস পেয়েছিলেন—বিশেষ করে ভারতীয় নারীর অবস্থার উন্নতি তাঁরা চেয়েছিলেন। কুসংস্কারের আবর্তে আচ্ছন্ন, আধুনিক শিক্ষা ও ন্যূনতম স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ভারতীয় নারীর অবস্থা সে-যুগে সত্যই শোচনীয় ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেইসময় যেসব মহামানব ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন নারীজাতির প্রতি, বিশেষ করে তাঁদের মায়েদের প্রতি। সেই প্রতিকূল পরিবেশেও ভারতীয় জননী শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মতো সন্তানের জন্ম দান করতে পেরেছিলেন। কীভাবে তা সম্ভব হল? ভারতের উন্নত সংস্কৃতিই এর কারণ, যা এ-দেশের জনসাধারণের শিক্ষা ও মানসিক বিকাশের হেতু। এই সংস্কৃতি নিরক্ষর মানুষকেও প্রাজ্ঞ করে তুলেছিল। এর ফলে, কোনও সংবিধান না থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ নৈতিক গুণাবলিতে গরীয়ান হয়ে উঠেছিল। এই সংস্কৃতি নিরক্ষর জনগণকে বোধশক্তিসম্পন্ন করেছিল এবং তার জন্য কোনও আইনের বাস্তবায়নের প্রয়োজন হয়নি।

স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম কার্যকারিতা হৃদয়ংগম করেছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি ভারতের সংস্কৃতি ও নারীসমাজের ওপর আস্থা রাখতে পেরেছিলেন। প্রতিটি প্রবহমান দশকেই তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির যাথার্থ্য ক্রমান্বয়ে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যান্য সকলের তুলনায় স্বামীজীর ভারতীয় নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল সবচেয়ে বেশি। প্রবুদ্ধ ভারতীয় নারীর সম্পূর্ণ রূপরেখা একমাত্র স্বামীজীই দিয়ে গেছেন। সমগ্র বিবেকানন্দ-সাহিত্যে—তাঁর বক্তৃতায়, ঘরোয়া আলোচনায়, কথোপকথনে ও চিঠিপত্রে নারীর শক্তির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও বিশ্বাস ফুটে ওঠে, যেগুলি ভারতীয় নারীর আত্মবিশ্বাস প্রজ্বলিত করে। নারীজাতির সমষ্টি-শক্তির প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। সেজন্যই পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছিলেন : ''পাঁচশো পুরুষের সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় করতে পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে, কিন্তু পাঁচশো নারীর দ্বারা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা সম্ভব।''

স্বামীজীর দৃষ্টিতে শক্তির বৈশিষ্ট্য শুধুই অবাধ ক্রিয়াশীলতা নয়। উচ্ছ্বসিত আড়ম্বরের তুলনায়

শক্তির সূক্ষ্ম ও অধরা প্রকাশ অনেক উচ্চমানের। স্বামীজী নারীজাতিতে শক্তিপ্রকাশের সেই দিকগুলির পূজারি ছিলেন যেগুলি নিয়ন্ত্রণ করে, রূপান্তর ঘটায়, মহীয়ান করে তোলে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কার্যক্ষেত্রে নারীদের বিভিন্ন ভূমিকার মধ্যে এই নীরব রূপান্তরকারী শক্তির অধিক প্রকাশ। এই রূপান্তরকারী শক্তিই সংস্কৃতি গড়ে তোলে ও সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। আদর্শ নারী সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য তাঁর জীবনের দুটি ঘটনা আলোচনা করব।

আমেরিকায় সহস্রদ্বীপোদ্যানে থাকাকালীন স্বামীজী একদিন শিষ্যদের চিতোরের রাজপুতদের কথা বলছিলেন। ভগিনী ক্রিস্টিন, মেরি ফাঙ্কি প্রমুখ নীরব হয়ে স্বামীজীর অনিন্দ্যকণ্ঠে শুনছিলেন, কীভাবে রানি পদ্মিনীর আকর্ষণে মোগল সম্রাট আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেছিলেন। রাজপুতরা প্রাণ বিসর্জন দিতেও রাজি কিন্তু রানির সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল। প্রথম দফায় আলাউদ্দিন পরাস্ত হলেও দ্বিতীয়বার যুদ্ধে চিতোর দুর্গের পতন হল। হানাদার সৈন্যদল চিতোরে প্রবেশ করলে সন্ত্রস্ত নাগরিকগণ পালিয়ে যেতে লাগল। প্রাসাদে রক্ষী, রাজকুমার ও রানি বিহ্বল ও ভীত হলেন। রানি পদ্মিনী ও অন্যান্য নারীরা তখন জহর ব্রত করে আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত হলেন। অন্দরমহলে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হল ও পদ্মিনীসহ রাজ্যের সব নারী আগুনে ঝাঁপ দিলেন। কথিত আছে সেদিন সাড়ে চুয়াত্তর হাজার কুলললনা ওই কুন্ডে আত্মবিসর্জন দেন। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুগুলির অন্যতম। তাঁরা কিন্তু অসম্মানের থেকে মৃত্যুকেই শ্রেয় ভেবেছিলেন। আলাউদ্দিন প্রাসাদে প্রবেশ করলে তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিল মৃতদেহের পোড়া গন্ধ ও ছাই।

একথা বলতে বলতে স্বামীজীর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। স্বামীজী নীরব হলেন। সেই মুহূর্তে যখন ক্রিস্টিন ও অন্যান্য শিষ্যারা সমবেদনার কথা বলতে গেলেন, স্বামীজী হঠাৎ তাঁদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, ''সেই রাজপুত নারীদের মতো হও।'' তাঁর চোখে দুঃখ নয়, ছিল গর্ব। তাঁদের বীরত্বের বন্দনা করলেন ওই কাহিনির মাধ্যমে। তাঁদের আচরণ অনুকরণীয় বলে তিনি ঘোষণা করলেন। এইভাবে তাঁদের জীবনের আদর্শনিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন স্বামীজী। দুঃখপ্রকাশ বা সমবেদনা জানালে সেই বীরত্ব ও আত্মত্যাগের অসম্মান করা হয়—এটিই স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি। স্বামীজীর চোখে এই হল আদর্শ নারীর কল্পমূর্তি।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে প্রকাশ পাবে ভারতীয় জননীর আদর্শ—যে-আদর্শকে স্বামীজী আক্ষরিক অর্থে পূজা করতেন। এর জ্বলন্ত নিদর্শন ছিলেন তাঁর জননী—ভুবনেশ্বরী দেবী। ছোট্ট বিলের সংবেদনশীল মনের গঠন তাঁর মায়ের জন্যই সম্ভবপর হয়েছিল। মায়ের কোলে বসে ভারতীয় সংস্কৃতির মহান সারমর্ম বিলে আহরণ করেছিল। যখন ভুবনেশ্বরী দেবী সীতার কথা বলতেন, তখন বিলে সীতার পবিত্রতা উপলব্ধি করত। যখন তিনি হনুমানের কথা বলতেন, বিলে হনুমানের প্রভুভক্তি অন্তরে অনুভব করত। মহীয়সী জননী চারিত্রিক দৃঢ়তায় যা বলতেন সবই বিলের কাছে ছিল অভ্রান্ত সত্য। মায়ের জীবনে বিলে মহান গুণাবলির বাস্তব প্রকাশ দেখেছিল। মাকে সানন্দে সকলের সেবায় রত দেখে সে স্বার্থশূন্য সেবার আনন্দ উপলব্ধি করত। যখন দেখত দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হলে মা সবার শেষে অন্নগ্রহণ করছেন এবং কোনওদিন ভিখারি এলে সেই অন্ন অম্লানবদনে দিয়ে দিচ্ছেন, তখন নরেন সেবার মূল্য হৃদয়ংগম করত।

একটা কথা গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। মা ও সন্তানের এই পবিত্রতম অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কই শিশুর মনে নৈতিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি সঞ্চারের আদর্শ পন্থা। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুকে

অনুপ্রাণিত করা যায় না, পুলিশের ভয় দেখিয়ে নিয়ম পালনে বাধ্য করা যায় না, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজে স্বীকৃত করা যায় না—অথচ একমাত্র মায়েরই ক্ষমতা আছে প্রত্যক্ষভাবে সন্তানকে প্রভাবিত করার। শিশুর শুভ সংস্কার গড়তে মা-ই সাহায্য করেন। এখানেই মাতৃত্বের মহত্ত্ব।

পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী উপলব্ধি করেন যে, কীভাবে ভারতীয় নারী ভারতের শক্তিশালী আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ও সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে রক্ষা করে চলেছে। তিনি সংস্কৃতির বিকাশ ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সংস্কৃতির সঞ্চারে নারীজাতির বিশেষ ভূমিকা প্রত্যক্ষ করেন। যদিও মায়ের কোলে বসে তিনি তাঁর সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা ও সংস্কৃতির সারমর্ম আহরণ করেছিলেন, তবুও পরিব্রাজক অবস্থায় সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করলেন যে, ভারতের কুটিরে কুটিরে ভারতীয় জননী সন্তানের মধ্যে সত্য, মহত্ত্ব ও পবিত্রতার বীজ রোপণ করে চলেছেন। পৌরাণিক যুগের মদালসা থেকে আধুনিক যুগের ভুবনেশ্বরী দেবী—এভাবেই ভারতীয় জননী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করে চলেছেন। এর ফলে স্বামীজীর সম্যক উপলব্ধি—''যে হস্তদ্বয় শিশুকে দোল দেয়, তাহাতেই ভগবানের প্রথম প্রকাশ।''

আমরা যাকে empowerment ও enlightenment বলি, স্বামীজীর কাছে তার অর্থ সুস্পষ্ট ছিল। পৃষ্ঠপোষক বা সমর্থকরূপে নয়, স্বামীজীর মতে নারীর ক্ষমতায়নের অর্থ সমগ্র নারীজাতির মধ্যে সেই দিব্য স্বরূপের স্বীকৃতি ও তার প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ। তিনি বলেন, ''এদেশে পুরুষ-মেয়েতে এতটা তফাত কেন যে করেছে তা বোঝা কঠিন। বেদান্তশাস্ত্রে তো বলেছে, একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। তোরা মেয়েদের নিন্দাই করিস, কিন্তু তাদের উন্নতির জন্য কি করেছিস বল দেখি?... তোদের জাতের যে এত অধঃপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এইসব শক্তিমূর্তির অবমাননা করা।... যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের, সে দেশের কখনো উন্নতির আশা নেই।''

স্বামী বিবেকানন্দের মতে নারীর সঠিক ক্ষমতায়ন তখনই হবে যখন শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশ ঘটবে, যা প্রত্যক্ষ করে সমাজ স্বতই তাদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানাতে বাধ্য হবে। সেই স্বীকৃতির অর্থ শক্তি ও বিশ্বস্ততায় নির্দ্বিধায় অনুপ্রাণিত করা এবং সেই স্তরের পবিত্রতায় উত্তরণ ঘটানো যা স্বাভাবিকভাবেই অন্যের মধ্যেও মহৎ প্রেরণা জাগায়। এককথায় এর অর্থ একটি প্রবুদ্ধ আত্মসচেতনতার বিকাশ যা মানুষকে মহান ও উন্নত করে। প্রকারান্তরে বলা যায় ক্ষমতায়ন মানে অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশকে ত্বরান্বিত করা।

এই empowerment বা ক্ষমতায়ন সাধনের প্রণালী হল enlightenment বা আলোকিত করা। স্বামীজীর দৃষ্টিতে এই প্রণালী হল এক সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা যার মাধ্যমে মানবিক অভিজ্ঞতার সম্ভাবনার সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। স্বামীজী চেয়েছিলেন ভারতীয় ভাবধারায় ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা। প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব ভাবধারা আছে। স্বামীজীর মতে আধ্যাত্মিক ভাবধারার সর্বোচ্চ বিকাশ ভারতেই হয়েছে এবং এই ভাবধারাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও কার্যকরী করা যায়। তাই স্বামীজী আমাদের সমাজের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম, ক্ষমতায়ন ও আলোকিত করার নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই নতুন সংজ্ঞা ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আমাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের সর্বোত্তম সারতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত ও বেদান্তের সর্বব্যাপী ভিত্তির উপর প্রোথিত।

গভীর মনোযোগে ইতিহাস অধ্যয়ন করে স্বামীজী অনুধাবন করেছিলেন যে ভারতীয়

সংস্কৃতির উত্তরাধিকার অনন্য। সেই কারণেই ভারতের সামাজিক পরিস্থিতিও অনন্য। উন্নয়নের পাশ্চাত্য মডেল বা ক্ষমতায়নের পাশ্চাত্য ধারণা এই পাঁচহাজার বছরের প্রাচীন আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশে প্রযোজ্য নয়। বরং এই দেশ ক্ষমতায়ন ও শিক্ষার নিজস্ব সংজ্ঞা নিরূপণ করেছে। সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে ভারতের অনন্যতা প্রকাশ পায় নিম্নোক্ত বিশেষত্বে : পারিবারিক গঠনপ্রণালী, নৈর্ব্যক্তিক সামাজিক গঠন ও ভোগবাদহীন জীবনদর্শন, জননীর পবিত্রতা সম্বন্ধে সম্যক বোধ, সন্তানের মানসিকতা গঠনে প্রসব-পূর্ব প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা, অনন্য আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি।

স্বামীজী জানতেন সমাজ সংস্কারের লক্ষ্য কী। তিনিই সর্বপ্রথম বলেন একটি ডানায় পাখি উড়তে পারে না। পুরুষ ও নারী উভয়ের উন্নয়ন প্রয়োজন। তাই ভারতের জন্য স্বামীজীর প্রথম পরিকল্পনা ছিল নারীজাতির উন্নয়ন। Empowerment এর জন্য স্বামীজীর উপায় হল enlightenment। তাই শিক্ষাই সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায় তাঁর রূপরেখায়। তিনি বলেন, ''শিক্ষা—জবাব পাইলাম।'' কিন্তু কীরকম শিক্ষা? তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, ''আমরা চাই সেই শিক্ষা যাতে চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে ও মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।'' সংজ্ঞাগত দিক থেকেই এই শিক্ষা আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আধ্যাত্মিকতাকেই স্বামীজী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখেছেন। তিনি মনে করতেন এই আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষিত হয়ে একটি প্রবুদ্ধ নারীজাতির উত্থান ঘটবে ও তারাই ভারতের উন্নয়ন সাধনে ব্রতী হবে। তিনি বলেছেন, ''আমাদের নারীদের আমি তাই বলি যা পুরুষদের বলি। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশ্বাস কর, তেজস্বিনী হও, আশায় বুক বাঁধো, ভারতে জন্ম বলে লজ্জিত না হয়ে তাতে গৌরব অনুভব কর, আর স্মরণে রেখ—আমাদের অপরাপর জাতির নিকট থেকে কিছু নিতে হবে বটে, কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আমাদের অপরকে দেবার জিনিস সহস্রগুণ বেশি আছে।''

নারীর উন্নতিকল্পে স্বামীজীর শিক্ষাপ্রণালীর যুগোপযোগী কয়েকটি সূত্র :

১। শক্তি—স্বামীজীর বজ্র-আহ্বান পুরুষ-নারী নির্বিশেষে শক্তিমান হওয়ার। তিনি বলেছিলেন, ''শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু।'' সবরকম শক্তি তিনি চেয়েছিলেন—দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি। শ্রদ্ধা, বিনয় ও ত্যাগ পুঁথি পড়িয়ে শেখানো যায় না। কিন্তু আদর্শ চরিত্র সামনে দেখতে পেলে শিক্ষার্থী এই সদ্‌গুণগুলি আয়ত্ত করতে পারে। একটি শিশু এই সদ্‌গুণাবলি শ্রদ্ধাসহ অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে জীবনে আয়ত্ত করতে পারে। নৈতিক শক্তিই সবচেয়ে বড় সম্পদ যা শিক্ষক বা পিতা-মাতা শিশুকে প্রদান করতে পারেন। এই নৈতিক দৃঢ়তাই তাকে বড় হয়ে ভ্রষ্টাচার থেকে রক্ষা করবে, তাকে মহৎ হওয়ার অনুপ্রেরণা দেবে। কিন্তু কীভাবে আসবে এই নৈতিক বল? আমাদের স্বরূপ থেকেই আসবে। পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে, ''ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠা বীর্য্যলভ্যঃ।'' পবিত্রতা থেকেই শক্তি আসে। পবিত্রতার সাধন মনের ময়লা দূর করে, তামসিক প্রবৃত্তি প্রশমিত করে ও সৎকর্মে প্রবৃত্ত করে। বারংবার সৎকর্মের অনুশীলনে আত্মবিশ্বাস জাগে। এটিই শ্রদ্ধার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি। তাই শ্রদ্ধা ও ব্রহ্মচর্যের কথা স্বামীজী বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পবিত্রতাই হল মৌলিক সদ্‌গুণ।

২। চরিত্রগঠন—সুন্দর জীবনের অপরিহার্য শর্ত হল চরিত্র। যে-শিক্ষাব্যবস্থা চরিত্রগঠনের দিকটিকে অবহেলা করে, সেই শিক্ষাব্যবস্থা ভ্রান্ত। প্রত্যেক মানুষকেই সমাজে কিছু দায়িত্বপালন করতে হয়। প্রতিটি মানুষের এই সামাজিক অবদানের সশ্রদ্ধ

স্বীকৃতি দিতে হয়। নারীজীবনে মাতৃত্বের একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা আছে। একটি সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু হল মাতৃত্বের ধারণা। এই কেন্দ্রীয় ভূমিকাটিকে অস্বীকার করে অপেক্ষাকৃত গৌণ ভূমিকাগুলিকে প্রাধান্য দিলে নারী-পুরুষের দায়িত্বগুলি সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় না। ফলে নানা সমস্যা দেখা দেয়।

বিজ্ঞান, কলা, ইতিহাসের সঙ্গে স্বামীজী চেয়েছিলেন নারীরা গৃহবিজ্ঞান ও শিশুপালনে প্রশিক্ষিত হোক। তিনি চাইতেন নারীরা এমন মর্যাদাসম্পন্ন আচরণে প্রতিষ্ঠিত হোক যাতে সমাজ স্বতই তাদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করবে। তিনি বলতেন, ''সতীত্বই জাতির জীবন।'' যে-সভ্যতাই সতীত্বকে অবহেলা করেছে, সে-সভ্যতা লুপ্ত হয়েছে—এটি ঐতিহাসিক সত্য।

নারীই পরিবারের কেন্দ্র এবং পরিবারগুলিই সমাজের চক্র আবর্তিত করে। চাকার কেন্দ্রের শক্তির উপরই সবকিছু নির্ভর করে। ভারতের বৈশিষ্ট্য চিন্তা করে স্বামীজী সীতাচরিত্রকে আদর্শ চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন—যাঁর চারিত্রিক শক্তির জন্যই ধর্মের জয় ও অধর্মের বিনাশ সম্ভব হয়েছিল। আদর্শের প্রতি একান্ত আনুগত্যই সীতা-চরিত্রের বিশেষ শক্তির প্রকাশ। সেজন্যই স্বামীজী বলেছিলেন, ''সীতা-আদর্শ নস্যাৎ করে আমাদের নারীজাতির আধুনিকীকরণের যে-কোনও প্রয়াস বিফল হবেই এবং তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি।'' পাশ্চাত্যে তিনি বলেছিলেন, ''আমি অবশ্যই চাই আমাদের নারীদের তোমাদের মতো বৌদ্ধিক অগ্রগতি হোক, কিন্তু যদি তার বিনিময়ে পবিত্রতা বিসর্জন দিতে হয়, তাহলে সেই 'অগ্রগতি' আমি চাই না।'' ভগিনী ক্রিস্টিন লিখেছেন স্বামীজী প্রায়ই ভাবী ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। তিনি তপস্যা, সতীত্ব, প্রেম ও বৌদ্ধিক উন্নতির সমন্বয়ের আদর্শ কল্পনা করতেন।

৩। স্বাধীনতা—''উন্নতির প্রথম শর্ত স্বাধীনতা।'' স্বামীজী স্বাধীনতার জয়গান করেছেন এবং দৈহিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমেরিকায় ছোট ছোট মেয়েদের সাঁতার কাটতে দেখে, নৌকা চালাতে দেখে স্বামীজী চাইতেন ভারতের মেয়েরাও স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ পাক। তিনিই প্রথম মানুষ যিনি বললেন, ''মেয়েদের সেই অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে যাতে তারা নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারে।'' স্বামীজী এইকথাও বলেছেন যা আর কেউ বলার সাহস দেখাননি, ''পূর্ণাঙ্গ নারীজীবনের আদর্শ হল পূর্ণ স্বাধীনতা।'' অবশ্য আমাদের ভুললে চলবে না যে স্বাধীনতার শর্ত হল প্রকৃত দায়িত্বশীলতা। সমাজ ও পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ, সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা—এসবই নির্ধারণ করবে কতটা স্বাধীনতার যোগ্যতা আমরা অর্জন করেছি। স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিতে হয়; সে-মূল্য হল অতন্দ্র সতর্কতা।

৪। কর্তব্য ও অধিকার—স্বামীজী চেয়েছিলেন সকলেই স্বধর্ম পালন করুক। যা মানুষকে ধরে রাখে, যার অভাবে মানুষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তাই-ই ধর্ম। ধর্ম হল নৈতিক কাঠামো যার অবলম্বনে আমাদের জীবনের সমস্ত ঘটনা ঘটে চলে। প্রাচীনকালে ধর্মই ভারতের সংবিধানরূপে কাজ করত। ধর্মই বলে দেয় কী আমাদের দায়িত্ব, কী করা উচিত, কী করা উচিত নয় এবং কেন ও কীভাবে কর্তব্যকর্ম আমরা করব। ধর্মের মাধ্যমে আমাদের উপলব্ধি হয় যে, স্বধর্ম পালনে মানুষের ক্রমবিকাশ হয়। শুধু অধিকারের জন্য আন্দোলনে কোনও বিকাশ হয় না। শোষিত শ্রেণি অবশ্যই স্বাধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম করবে, কিন্তু দায়িত্বপূর্ণ আচরণ থেকে বিচ্যুত হবে না।

হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের প্রথম ধর্ম হল তার স্বরূপ সন্ধান। দ্বিতীয় ধর্ম—নিজের অবস্থানের

মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে দায়িত্বপালনের মাধ্যমে বিকাশ সাধন। এটিই স্বধর্ম। নারীত্ব ও মাতৃত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা নারীদেরই দায়িত্ব। মহৎ চরিত্রের ব্যক্তি সমাজে প্রকৃত শ্রদ্ধালাভ করে থাকেন। সংস্কৃতে একটি সুন্দর কথা আছে—'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ'। ধর্মাচরণে রত থাকলে ধর্ম মানুষকে রক্ষা করে। অতএব অধর্মাচরণ করলে ধর্ম নারীকে রক্ষা করবে না। নারীদের সুরক্ষা-সম্বন্ধীয় এই মনস্তাত্ত্বিক-আধ্যাত্মিক সূত্র আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। স্ত্রী ও জননী হিসেবে স্বধর্মের মাধ্যমে বিকাশ সাধনও নারীর কর্তব্য। স্বামীজী ভাবী ভারতীয় নারীর কাছে প্রত্যাশা করেছিলেন যে শিক্ষা ও সচেতনতা প্রসারের মাধ্যমে তারা সচেতনভাবে ভারতের মহান সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হবে।

৫। স্বরূপচিন্তন—কোনও সমস্যার মূলে না যেতে পারলে তার সমাধান অসম্ভব। মানুষ স্বরূপত দৈবসত্তার স্ফুলিঙ্গ। মানুষ চৈতন্যময়—যে-চৈতন্যের আর এক নাম আত্মা। এটাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। বেদান্ত অনুযায়ী মানুষের স্থিতিকে পঞ্চকোষে বিধৃত বলা হয়েছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ থেকে যথাক্রমে দেহ, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি হয় এবং আনন্দময় কোষ থেকে হয় কারণ শরীর। পুরুষ ও নারীর পার্থক্য শুধুমাত্র অন্নময় কোষে। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের এক-পঞ্চমাংশে। অবশিষ্ট চারটি কোষ একই। দেহ-চৈতন্য থেকে মনের উত্তরণ ঘটলে লিঙ্গভেদ সম্বন্ধে সচেতনতাই থাকে না। নারীর প্রধান দুর্ভাগ্য এই অন্নময় কোষের সঙ্গে একাত্মবোধের জন্যই আসে। এটাই আমাদের নিজেদের প্রতি চরম অন্যায় যে আমরা নিজেদের দেহসর্বস্ব বলে চিন্তা করি, যে-দেহ কিনা আমাদের ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বাইরের কোষ মাত্র। আমরা যা চিন্তা করি, তাই আমাদের থেকে বিচ্ছুরিত হয়। এই দেহাত্মবোধ অতিক্রম করতে পারলেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দেহাত্মবোধ ছাড়িয়ে আমাদের ব্যক্তিত্বের উচ্চতর স্তরের বিকাশ সাধনে ব্রতী হতে হবে। এই মর্যাদাসম্পন্ন আত্মচিন্তা থেকেই উত্তরণ ও ক্রমবিকাশ সম্ভবপর। আত্মবিকাশের অর্থ তাই নিজ ব্যক্তিত্বের উচ্চতর স্তরে আরোহণ। প্রকৃত প্রগতি তখনই ঘটে যখন দেহাত্মবোধ হ্রাস পায়। উন্নত মননের চর্চা, পরিশীলিত মানসিক আবেগ, বিশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি ও পরিণত বৌদ্ধিক শক্তি একটি সুষম জীবনের অঙ্গ। এই ক্রমবিকাশের শেষ সোপান আত্মজ্ঞান। এটাই ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে গঠিত বিকাশের ছাঁচ।

স্বামীজী অনুভব করেছিলেন যে এই উপলব্ধি নারীজাতির সহজাত। এই কারণেই তাঁর নারীজাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। উচ্চ আদর্শ, জ্ঞান, ভক্তি ও সেবা ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সার তত্ত্ব। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী বলেছিলেন, ''কোন শাস্ত্রে লেখা আছে যে মেয়েরা জ্ঞান ও ভক্তির অধিকারী নয়? অবক্ষয়ের যুগে যখন পুরোহিতরা অন্য বর্ণের বেদপাঠের অধিকার কেড়ে নেয়, তখন তারা মেয়েদেরও সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। বৈদিক ও ঔপনিষদিক যুগে মৈত্রেয়ী, গার্গী ও অন্যান্য মহীয়সী নারী ব্রহ্মবিদ্যায় ঋষিস্থানীয়া হয়েছিলেন। যখন এই প্রাতঃস্মরণীয়া নারীগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের অধিকারী ছিলেন, তখন আধুনিক যুগের নারীরা সেই অধিকার পাবে না কেন? যা আগে ঘটেছে, তা আবারও ঘটতে পারে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।''

কোনও ধারণার বাস্তবায়ন তখনই ঘটে যখন একটি জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে থাকে। সেই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলেন শ্রীমা সারদা দেবী। স্বামী বিবেকানন্দ পবিত্রতাস্বরূপিণী মাকে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর দিব্যজীবনে ভারতীয় সংস্কৃতির সারতত্ত্ব জগতের সম্মুখে প্রকাশ করে গেছেন। স্বামীজীর মতে শ্রীশ্রীমার অনুপ্রেরণায়

ভারতীয় নারীর উত্থানের মাধ্যমে এক নৈতিক বিপ্লব ঘটে যাবে। স্বামীজী বলেছেন, ''মা-ঠাকুরানী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন।''

শ্রীশ্রীমা তাঁর বিস্ময়কর বৈরাগ্য ও দৈনন্দিন জীবনে আধ্যাত্মিক সত্যের প্রয়োগের মাধ্যমে নারীজাতির মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মসম্মান জাগরিত করেছেন। শ্রীশ্রীমার জীবনদর্শনই আজকের ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়ে থাকা নারীকে আত্মরক্ষার শক্তি দেবে। তাঁর জীবন ভারতীয় সংস্কৃতির মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ। তাঁর পবিত্রতা, নিষ্কলুষ প্রেম ও বিশ্বজনীন মাতৃত্ব সমগ্র নারীজাতিকে মর্যাদাসম্পন্ন করেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে শান্তি, আশা, বিশ্বাস ও প্রেমের জাগরণ ঘটিয়েছে। এইসকল আদর্শের রূপায়ণেই কেবল নারীজাতি শ্রদ্ধা ও পূজার আসনে স্থান করে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। স্বামী বিবেকানন্দ এ-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। ভগিনী ক্রিস্টিন স্মৃতিচারণ করেছেন, ''প্রাচীন গ্রীসের নারী যেমন শারীরিক দিক থেকে নিখুঁত ছিল, আধুনিক ভারতীয় নারী তেমনি বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে সর্বাঙ্গসুন্দর হবে—যে-নারী হবে মাধুর্যময়ী, প্রেমময়ী, দয়াশীল, সহনশীল, ধৃতিমান, হৃদয় ও বুদ্ধিতে মহৎ, কিন্তু সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতায় অনবদ্য।'' ✠

অনুবাদ : ওঙ্কারনাথ চট্টোপাধ্যায়

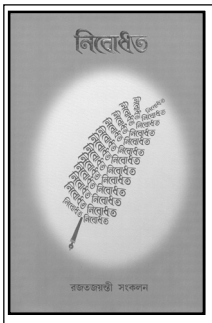

নিবোধত রজতজয়ন্তী সংকলন

নিবোধত পত্রিকার রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে
প্রকাশিত অমূল্য সংকলনগ্রন্থ

- ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চমানের নানা রচনায় পঁচিশ বছর ধরে নিবোধত পত্রিকা সমৃদ্ধ। পত্রিকার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সেই মূল্যবান রচনাসম্ভার থেকে নির্বাচিত প্রায় একশোটি রচনা নিয়ে একটি সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।
- রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিবৃন্দ ও শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনীবৃন্দের রচনার সঙ্গে সংকলনগ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে বহু জ্ঞানীগুণী বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্বনামধন্য লেখক-লেখিকাদের রচনা, যাঁরা কয়েক দশক ধরে মননের আলোকে আলোকিত করে রেখেছেন বঙ্গের সারস্বত মন্দির।
- গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৭২। মূল্য ১৫০ টাকা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—কলকাতা : ৩৫ টাকা; পশ্চিমবঙ্গ (কলকাতা ছাড়া) ও অন্যান্য রাজ্য : ৭০ টাকা; কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু : ৯০ টাকা।
- **শ্রীসারদা মঠের শোরুম** (দূরভাষ : ২৫৬৪-৫৪১১) ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের সকল শাখাকেন্দ্র থেকে গ্রন্থটি সংগ্রহ করা যাবে ।
- রামকৃষ্ণ মিশনের যেসকল কেন্দ্রে গ্রন্থটি পাওয়া যাবে : **উদ্বোধন কার্যালয়, অদ্বৈত আশ্রম, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, যোগোদ্যান।**